

গণশত্রুদের মুখপাত্র হিসেবে যে বক্তব্য তারা প্রচার করছেন— তৃতীয় মত

আবদুল গাফফার চৌধুরী

মাত্র দু'দিন আগে ঢাকার দৈনিক ভোরের কাগজে 'এরা শয়তানের কাছে নিজেদের আত্মা ও বিবেক বিক্রি করে দিয়েছে' শীর্ষক একটি লেখা লিখেছি। তাতে একুশে আগস্টের ঘটনার পর উদ্যোগ পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর জন্য যে ব্রিগেড অব ডার্ট ট্রিকসকে কলম হাতে মাঠে নামানো হয়েছে, তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। আমার অনেক পাঠক তাতে খুশি নন। আমার লন্ডনের এক পাঠক তো রেগেমেগে টেলিফোন করে বলেছেন, 'এরা সম্পাদক ও বুদ্ধিজীবী নামের আড়ালে আসলে বাংলাদেশের গণশত্রুদের চর। আপনি তাদের বক্তব্য তুলে ধরে সে কথা আরও বিশদভাবে আলোচনা করছেন না কেন? দেশের এই বিপন্ন মুহূর্তে এদের কোন কথাই আনচ্যালেঞ্জড যেতে দেয়া উচিত নয়।'

শুধু একজন নয়, কয়েকজন পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকেই তাড়া খেয়ে ঠিক করেছিলাম, গত ২৪ আগস্ট মঙ্গলবার সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকায় শফিক রেহমানের যে লেখাটি বেরিয়েছে, তা নিয়ে এ সপ্তাহে তৃতীয় মত কলামে একটু বিশদ আলোচনা করব। ঠিক এই সময় দৈনিক যুগান্তরের ২৭ আগস্টের সংখ্যায় দেখি ফরহাদ মজহারের আরেকটি লেখা— তারও বিষয়বস্তু ২১ আগস্টের ঘটনা এবং এই লেখাটিতে জাতীয় সংকট মোকাবেলা করার জন্য 'গণত্রয়' গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়েছে। ফরহাদ মজহারের লেখালেখি নিয়ে আমি আজকাল আর আলোচনা করি না। কারণ, তিনি এখন আর লেখক নন একজন দার্শনিকও বটে। তার দর্শনতত্ত্বের মারেফতি রহস্য আমার পক্ষে সব সময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। গ্রাম্য পীরের আস্তানার সঙ্গে মার্কসবাদের এবং লুপ্ত-গামছার সঙ্গে দু'কানে দু'মোবাইল ফোন নিয়ে পাঁচতারা হোটেলের প্রবেশের দার্শনিকতা মিশ্রণের গূঢ় রহস্য সত্যিই আমার মতো দীনহীনের পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর।

২৭ আগস্ট তারিখে যুগান্তরে প্রকাশিত ফরহাদ মজহারের লেখাটির দর্শন-চিন্তা একটু সরল। তার মারেফতি গূঢ় রহস্যও আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি মনে হচ্ছে। একটু উপমা দিয়েই কথাটা বলি। বহুকাল আগে ও' হেনরির একটা গল্প পড়েছিলাম। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ের এক ল' এনফোর্সার বুড়ো বয়সে দেশের পর্বতসঙ্কুল প্রত্যন্ত অঞ্চল ছেড়ে বড় কোন শহরে গিয়ে বসবাস করবেন ঠিক করেছিলেন। ঘোড়াটিকে দানাপানি খাইয়ে তিনি রওনা হয়েছেন। পথে নেমে দেখেন, একটি অরক্ষিত গ্রাম দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তারা ঘরবাড়ি লুট করছে। পুরুষদের বেঁধে রেখেছে। মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছে। এককালের ল' এনফোর্সার ভদ্রলোক সবটা দেখে একটা পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ডাকাতদের দিকে গুলিবর্ষণ শুরু করলেন। ডাকাতরা ভাবল, তারা বহু লোকের পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন। তাই চিৎকার করে বলতে শুরু করল, আপনারা কারা? গুলি চালাবেন না। এই গ্রাম ডাকাতদের আস্তানা। তাদের দমাতে আমরা এসেছি। গ্রামের লোকদের আমরা এক জায়গায় একত্র করছি। এ সময় আপনারা বাধা দিয়ে আমাদের ঐক্য ভাঙবেন না। তাতে ডাকাতরা সুবিধা পেয়ে যাবে।

সব গল্পটা এখানে বলা দরকার নেই। আমার নিজেরও সবটা মনে নেই। ভাসাভাসা মনে আছে। তবে যুগান্তরে প্রকাশিত ফরহাদ মজহারের লেখার গণত্রয়ের সংজ্ঞার সঙ্গে ও' হেনরির গল্পের গণত্রয়ের সংজ্ঞার চমৎকার মিল দেখে বিমূঢ় হয়েছি। ডাকাতি দমনের জন্য ডাকাতের সঙ্গে ঐক্য গড়ার এমন চমৎকার দর্শন-তত্ত্বের মারেফতি রহস্যটা কি, তা বুঝতে গিয়ে আমাদেরও প্রথমে ধাঁধায় পড়তে হয়েছিল। পরে যখন বুঝতে পেরেছি, তখন ফরহাদ মজহারকে মনে মনে বাহবা দিয়েছি। পাঠক মনে 'ওয়াসওয়াসা' মনে করে তার কলমের শক্তি ভাসাভাসা করে।

ফরহাদ মজহার আপাতত থাক। যদি এই লেখায় স্থানাভাব না ঘটে এবং সময় ও সুযোগ হয়, তাহলে আসল শত্রুকে রেখে ফরহাদ মজহারের 'মার্কিন-ইহুদিবাদী বিজেপি'র বা 'আন্তর্জাতিক কর্পোরেট স্বার্থের' চক্রান্তের পেছনে ধাওয়া করা, দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোর সশস্ত্র 'গরিব ছাত্রগুলোর' জন্য অশ্রবর্ষণ, ঢাকায় বিদেশী দূতাবাসগুলোর তৎপরতা এবং একুশের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর জাতীয় ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টাকে তার কথিত গণত্রয় (কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো) গড়ে তোলার পথে বাধা বলে কেন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেই মারেফতি রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করব। এখন শফিক রেহমানের 'দিনের পর দিন' কলামের চিরযৌবনপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকা মিলা ও মইনের কথোপকথনের দিকে একটু নজর ফেরাই।

দেশে সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপকতায়— বিশেষ করে ২১ আগস্টের ঘটনায় শফিক রেহমানের কলামের নায়ক-নায়িকা ভয়ানকভাবে ভীত। অনেকে বলেন, এই নায়ক শফিক রেহমান নিজেই। তা যদি হয়, তাহলে এই কলামটি লেখা তিনি শুরু করেন প্রায় চার দশকেরও আগে। সম্ভবত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানীতে একটু ভিন্ন শিরোনামে তিনি কলামটি লেখা শুরু করেন। তখনই তার (তিনি আমার সমবয়সী) যৌবন পশ্চিমে হেলে পড়ছে। এখন তো বার্ধক্যে পৌঁছেছেন। তারপরও টেলিফোনে পরকীয়া প্রেম চালিয়ে যাওয়ার মতো রসবোধ ও কুয়ত তার আছে, এটা ভেবে তার সম্পর্কে আমি ঈর্ষাবোধ করি। প্রার্থনা করি তিনি চিরযুবা থাকুন এবং তার মিলাকেও যেন কখনও বার্ধক্যে না ধরে।

মইনের জবানিতে শফিক রেহমান দেশে সন্ত্রাস বেড়ে চলায় খুব 'শংকিত'। তার মতে, বন্যাত্রাণ কর্মসূচিতে বর্তমান সরকার যখন দু'হাতে প্রশংসা কুড়াচ্ছে (দেশ-বিদেশের কোন কাগজেই এই প্রশংসা আমি দেখছি না। কেবল সরকার কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষককে ঢাকায় দাওয়াত করে এনে প্রশংসাপত্র আদায় করছে) তখন এই সন্ত্রাস চালানো সরকারের জনপ্রিয়তা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র। তাতে লাভবান হচ্ছে আওয়ামী লীগ। কারণ, সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতায় সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট হচ্ছে। শফিক রেহমানের আরও দাবি, সরকার অপারেশন ক্লিন হার্ট, দ্রুত বিচার আইন ইত্যাদি দ্বারা সাফল্য অর্জন করেছে। কিছু সন্ত্রাসী হত্যা করে, ফাঁসি দিয়ে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

অপারেশন ক্লিন হার্টের অভিযানের সময় যে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি বিনা অভিযোগে, শুধু সন্দেহক্রমে গ্রেফতার হয়ে বিনাবিচারে যৌথ কমান্ডের হেফাজতে থাকাকালে 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে' এবং তাতে সারাদেশে প্রতিবাদ ও অসন্তোষ গুঞ্জরিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে শফিক রেহমান নীরব। র‍্যাব গঠনের ফলে দেশে কী ঘটছে, তাও দেশবাসীর জানা। দ্রুত বিচার আইনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাদের ধরা হচ্ছে এবং এই সেদিনও র‍্যাবের হেফাজতে থাকাকালে কার বা কাদের নির্মম মৃত্যু ঘটেছে, সে বিষয়টিও শফিক রেহমান চেপে গেছেন। কাস্টডিটে থাকার সময় কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর মৃত্যু সম্পর্কেও দেশের মানুষের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষ। প্রথমত, কোন ভয়ানক অপরাধীকেও বিনাবিচারে হত্যার অধিকার কোন সরকারের নেই। দ্বিতীয়ত, এই সন্ত্রাসীদের যে বিচারের সম্মুখীন করার আগেই মেরে ফেলা হল, তাতে অনেকেরই সন্দেহ, উচ্চ মহলের গডফাদারদের রক্ষা করার জন্যই এই কাজটি করা হয়েছে।

তথাপি বন্যাত্রাণ থেকে সন্ত্রাস দমন পর্যন্ত সব ব্যাপারে জোট সরকারের ব্যর্থতাগুলোকে শফিক রেহমান যদি সাফল্য বলে চালাতে চান, তাহলে কারও কিছু আপত্তি করার থাকতে পারে না। কারণ, তার বর্তমান ভূমিকা দেশবাসীর ভালভাবে জানা। দেশের মানুষ নিজেরাই বিচার করতে সক্ষম, তিনি দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের যে সাফল্যের খতিয়ান দিচ্ছেন, তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কতটুকু। কিন্তু তিনি যখন দেশের অব্যাহত সন্ত্রাস, একের পর এক পলিটিক্যাল কিলিং ও মার্ডার— বিশেষ করে ২১ আগস্টের যে ঘটনায় গোটা বিশ্ব বিস্ময় ও বেদনায় হতবাক, তা নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং আসল অপরাধীদের আড়ালে রাখার অপচেষ্টা চালান, তখন এই বিবেকবর্জিত হৃদয়হীন সাম্প্রতিকতাকে প্রিয় জ্ঞানানোর ভাষা দিয়ে ফেলতে হয়।

শফিক রেহমান কি তার ২৪ আগস্টের লেখাটি লেখার জন্য ২১ আগস্টের অসংখ্য নির্দোষ ও নিরীহ মানুষের রক্ত এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের চোখের অশ্রু শুকানোরও সময় দিতে পারলেন না? বিশ্বাস করতে কঠিন হয়, এই শফিক রেহমান একদিন এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ‘লোন রেঞ্জারের’ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন!

শফিক রেহমান লিখেছেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দরে— রোববার ও সোমবার দু’দিন ধর্মঘট। মঙ্গলবার ও বুধবার ২৪ ও ২৫ আগস্ট দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্রলীগ হরতাল ডেকেছে। ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে থ্রেনেড পাওয়া গেছে, যার উদ্দেশ্য হতে পারে জেলের দেয়াল ভাঙা ও বন্দিদের জেল পালানোতে সাহায্য করা। গত মার্চে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশে যে ধরনের বিশৃংখলা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আশা করেছিলেন, ঠিক সে রকমটাই হয়েছে এখন আগস্টের শেষদিকে।’

একটি পরিকল্পিত ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যা প্রচেষ্টা এবং বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসী ঘটনার কী চমৎকার বিশ্লেষণ! শফিক রেহমানের আসল কথা, আবদুল জলিল ঘোষণা দিয়ে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে দেশে যা ঘটতে চেয়েছিলেন, আগস্ট মাসে তা ঘটিয়েছেন। সরকার বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চাল মার্চ-এপ্রিল মাসের মতো মোকাবেলা করতে পারেনি। অর্থাৎ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যে অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারেনি, এই আগস্ট মাসে তা সৃষ্টি করেছে। শফিক রেহমানের এই যুক্তি অনুসারে ২১ আগস্টের যে ভয়াবহ থ্রেনেড হামলায় আইভি রহমানসহ অসংখ্য নিরীহ নর-নারী মারা গেছেন, আওয়ামী লীগের বহু কেন্দ্রীয় নেতা আহত হয়েছেন এবং স্বয়ং শেখ হাসিনার যে ঘটনায় প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকা দেখা দিয়েছিল তা ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটিই।

বিশ্বের রাজনৈতিক অভিধানে গোয়েবলসের নামটির বদলে এখন শফিক রেহমানের নামটি বসিয়ে দেয়া উচিত। ঢাকায় ২১ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে গোয়েবলসও এতটা নির্লজ্জ প্রচারণা চালাতে পারতেন না। ২১ আগস্টের ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঢাকার অধিকাংশ জাতীয় দৈনিকে যে খবর বেরিয়েছে তাতে দেখা যায়, সিটি ভবনের ওপর থেকে উপর্যুপরি চৌদ্দ-পনেরটি থ্রেনেড নিক্ষেপ করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করা সম্ভব না হওয়ায় সমভূমি থেকে ওই গাড়ি লক্ষ্য করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো গুলিবর্ষণ করা হয়। এ সময় একটি সামরিক জিপকে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে দেখা যায়। হাসিনার গাড়ি বুলেটপ্রুফ না হলে তার মৃত্যু ছিল অবধারিত।

আওয়ামী লীগ কি তাহলে তাদের নেত্রীসহ অধিকাংশ নেতাকে হত্যা করার জন্য এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল? সেই উদ্দেশ্যে তারা সিটি ভবনের ছাদ থেকে থ্রেনেড নিক্ষেপ করে সফল না হওয়ায় সমভূমি থেকে শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি চালিয়েছিল? আর আওয়ামী লীগের এই সন্ত্রাসকে সাহায্যদানের জন্যই কি এত বড় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার সময় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা গেছে এবং ঘটনা ঘটার পরই মাত্র আহত-নিহতদের উদ্ধারকার্যে রত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার চালিয়েছে? সবচেয়ে বড় কথা, ২১ আগস্টের ঘটনাটি ঘটানোর পেছনে যদি আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ছিল শফিক রেহমানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন বা সরকার পরিবর্তন করা, তাহলে শেখ হাসিনাসহ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতাকে মেরে ফেলে তারা ক্ষমতায় বসাত কাদের? যায়যায়দিনের ২৪ আগস্টের নিবন্ধটিতে এই প্রশ্নের জবাব নেই।

আরও একটি কথা। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থ্রেনেড রাখল কারা? আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে এই থ্রেনেড আছে তা ইনকিলাব বা সংগ্রামের মতো কাগজের খবরেও কখনও জানা যায়নি। বরং চট্টগ্রামে যে ১০ ট্রাক ভর্তি অস্ত্র আটক করা হয়, তাতে এ ধরনের থ্রেনেড পাওয়া গেছে এবং এই অবৈধ অস্ত্র আমদানির সঙ্গে জোট সরকারের এক হোমরাচোমরাই যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ

উঠেছিল। তখনই গুজব উঠেছিল, বঙ্গবন্ধুর অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হত্যাকারীদের জেল ভেঙে মুক্ত করার একটা চক্রান্তের আভাস পাওয়া গেছে। এখন জেলে থ্রেনেড পাওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে যুক্ত করার চেষ্টা কি একটি দুষ্কপোষ্য বালকের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে? দেশের জেল-ব্যবস্থা ও প্রশাসন এখন জোট সরকারের হাতে। সে অবস্থায় অত বড় একটি থ্রেনেড জেলে চালান দেয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হল কী করে? আওয়ামী লীগের হাতে কী আলাদিনের জাদুর চেরাগ ছিল যে, তারা চিচিং ফাঁক বললেন, অমনি জেলের দরজা খুলে গিয়েছিল? আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিলের সঙ্গে শফিক রেহমানের গোপন সখ্য আছে বলে আমার সন্দেহ হয়। নইলে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে জলিল দেশে ঘোর অরাজকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং সেই অরাজকতাই ২১ আগস্ট ঘটানো হয়েছে, এমন গোপন পরিকল্পনা তিনি জেনে ফেললেন কী করে? এ কথা এখন সর্বজনবিদিত, আবদুল জলিলের ৩০ এপ্রিলের ঘোষণাটি ছিল একটি অন্তঃসারশূন্য ভ্রমকি। এ ঘোষণার সঙ্গে ধর্মঘট, হরতাল, সভা-মিছিল অর্থাৎ যার সাহায্যে অরাজকতা সৃষ্টি করা যায়, তার কোন কর্মসূচিই ছিল না। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও এ ঘোষণা দেয়ার কারণ এবং কর্মসূচি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কোন কর্মসূচিই ছিল না ৩০ এপ্রিলের ঘোষণার সঙ্গে। আবদুল জলিল এমনভাবে কথাবর্তা বলছিলেন, যেন তার জামার হাতার নিচে একটি ম্যাজিক বক্স লুকানো আছে। সেই ম্যাজিক বক্সের সাহায্যে তিনি রাতারাতি সরকারের পতন ঘটিয়ে ফেলবেন।

এ ঘোষণাটিকে দেশের অধিকাংশ মানুষ সিরিয়াসলি নেয়নি। নিয়েছিল তামাশা হিসেবে। শেষ পর্যন্ত ঘোষণাটি তামাশাতেই পরিণত হয়। কিন্তু সবকিছু জেনেও নেও জোট সরকার এ ঘোষণাটিকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করে দেশময় নির্যাতন চালানোর অজহাত হিসেবে ব্যবহার করে। এ সময় গণগ্রন্থতার ও গণনির্যাতনের যে রেকর্ড সৃষ্টি করা হয়, তার কোন নজির স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই। সে সময় দেশে যে সভা, মিছিল চলছিল, তা ছিল বৈধ, শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক সভা-মিছিল। কোথাও কোন অরাজকতা, বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয়নি। তথাপি সরকারের গণনির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর তিন মাসও কাটেনি। শফিক রেহমান এরই মধ্যে আবিষ্কার করেছেন, ৩০ এপ্রিলের ঘোষণায় দেশে অরাজকতা সৃষ্টির প্লান-পরিকল্পনা ছিল। অথচ যে ঘোষণায় অরাজকতা সৃষ্টি দূরে থাক, একটি সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক আন্দোলনেরও কোন কর্মসূচি ছিল না।

আওয়ামী লীগেরই কোন কোন প্রভাবশালী নেতার মুখে অভিযোগ শুনেছি, মার্চ-এপ্রিল মাসে জোট সরকারের বিরুদ্ধে দেশে যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, আবদুল জলিলের ঘোষণা তাকে সাবোটাজ করেছে। জাদুমন্ত্রে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন ঘটবে, এ ঘোষণা শুনে দেশের মানুষ এবং আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মী আর আন্দোলনে এগিয়ে আসার উৎসাহবোধ করেননি। কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন, জলিল সাহেবের ঝোলের মধ্যে এমন কিছু আছে, যার সাহায্যে কোন আন্দোলন-টান্ডোলন ছাড়াই তিনি সবাইকে ভেঙ্কি দেখিয়ে দেবেন। ভেঙ্কি দেখাতে গিয়ে তিনি নিজের নাক কেটেছেন, দলের নাক কেটেছেন এবং তার অসার বাগাড়ম্বরের ফলে দেশে যে আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত তাও মুখ থুবড়ে পড়ে। ৩০ এপ্রিলের এ ঘোষণা দেশের মানুষকে হাসির খোরাক জুগিয়েছে আর শফিক রেহমান তার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সরকার উচ্ছেদের গোপন গভীর ষড়যন্ত্র। আবদুল জলিলের ৩০ এপ্রিলের ঘোষণাকে এতটা ক্রেডিবিলিটি দান দেশের কোন সুস্থ মাথার মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আগাম ঘোষণা দিয়ে কেউ ষড়যন্ত্র সফল করতে চায় একথা প্রথম শফিক রেহমানের কাছ থেকে জানলাম। তাহলে হাসিনা সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতের মঞ্চ থেকে যতবার সরকারের পতন ঘটানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই কি ছিল দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র? বিরোধী দলের নেতা থাকাকালে বেগম খালেদা জিয়া একাধিকবার বলেছেন, ‘এই সরকারকে (হাসিনা সরকারকে) আর একদিনও ক্ষমতায় থাকতে দেয়া যাবে না।’ এ ঘোষণার অর্থ কি

ছিল অবৈধ পন্থায় ষড়যন্ত্র করে হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো? শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা তো আজ নতুন নয়। এর আগে তার প্রাণনাশের আরও দুটো বড় চেষ্টা হয়েছে। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় এমপি আহসান উল্লাহ মাস্টারকে দিনদুপুরে গুলি চালিয়ে হত্যা করার পর এ আশঙ্কাটির কথাই অনেকে ব্যক্ত করেছেন যে, এরপর আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা-এমনকি শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হবে। এরপর শেখ হাসিনা এই সেদিন যখন টাকির ইস্তাম্বুল শহরে একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন, তখন তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। শেখ হাসিনার প্রাণনাশের কোন হুমকিকেই বিএনপি-জামায়াত সরকার কোন প্রকার গুরুত্ব দেয়নি বরং তা নিয়ে বহু দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করা হয়েছে। ইস্তাম্বুলে দেয়া হাসিনার প্রাণনাশের হুমকির পর জোট সরকারের নেতা-নেত্রী চরম দায়িত্বহীন এমন উক্তিও করেছেন, ‘তাকে যদি হত্যা করতে হয়, তাহলে বিদেশের মাটিতে কেন, দেশের মাটিতেই তো করা হতে পারে।’

শফিক রেহমান এ ঘোষণাটি সম্পর্কে কী বলবেন? কেউ যদি বলেন, দেশের মাটিতেই যে শেখ হাসিনাকে হত্যা করা হতে পারে— সেই হুমকি কতটা বাস্তব, গত ২১ আগস্ট তারই মহড়া দেয়া হয়েছে, তাহলে তিনি কী জবাব দেবেন? আমি তার কাছ থেকে কোন জবাব আশা করি না। কারণ, ফাউস্ট কবিতার মিসেস্টিফিলিস ও ফাউস্টের ধ্রুপদী কথোপকথনের বিবরণ তিনি জানেন কিনা জানি না। এই কথোপকথনের মূল কথাই ছিল শয়তানের কাছে একবার আত্মা বন্ধক রাখা হলে তা আর মুক্ত করা যায় না। শফিক রেহমানের ২৪ আগস্টের লেখাটিতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ২১ আগস্টের ঘটনার পর দেশে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়, স্থানবিশেষে ট্রেনলাইন অচল করা হয়, ধর্মঘট ও সভা-মিছিল চলে শফিক রেহমান তাকে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র আখ্যা দেয়ার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছেন। অথচ এটা ছিল একটা ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া। বায়ান্ন বছর আগে আরেক ২১-এর (১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি) হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে শফিক রেহমান ছিলেন আমার সঙ্গে। সেবারও দেশব্যাপী উত্তাল গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। জনতার রক্তরোধের ভয়ে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তার সরকারি বাসভবন ছেড়ে পালিয়েছিলেন। শফিক রেহমান সে সম্পর্কে এখন কী বলবেন? সেই একুশের বিক্ষোভও কি ছিল নূরুল আমিন সরকারের উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য কোন দলের ষড়যন্ত্র?

আজকের লেখাটি বড় হয়ে গেল। স্থানাভাব। তাই শফিক রেহমানের আরও কিছু বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এবং ফরহাদ মজহারের ‘গণত্রয়ের’ মারেফতি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা অপূর্ণ রইল। যদি সময় ও সুযোগ হয় আমার অন্য একটি লেখায় তা আলোচনার ইচ্ছে রইল।

লন্ডন ॥ ২৯ আগস্ট রোববার ॥ ২০০৪